২৮-০৯-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - রাবণ তোমাদের পুরোনো শত্রু। বিকার-রূপী রাবণের সাথে তোমাদের এই যুদ্ধ ভয়ঙ্কর বিপদজনক। কিন্তু তোমরা যতই এক ও একামাত্র শিববাবার সাথে স্মরণের যোগে থাকতে পারবে, ততই শত্রুর উপর বিজয় প্রাপ্তির বল পেতে থাকবে"

প্রশ্ন :- তোমাদের অর্থাৎ বি.কে. ব্রাহ্মণদের ডিপার্টমেন্ট, জগতের অন্য মানুষদের থেকে একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির - সেই ডিপার্টমেন্টটি কি ?

উত্তর :- বি.কে. ব্রাহ্মণদের ডিপার্টমেন্ট হলো, শ্রীমৎ অনুসারে চলে পবিত্র হওয়া এবং অন্যদেরকেও পবিত্র বানানো - একমাত্র তোমরাই যোগবলের দ্বারা নিজেদের পাপকে ভষ্ম করতে পারো। এই বাবাই তোমাদের সেইসব মনোকামনাগুলি পূর্ণ করে দেন। কিন্তু অন্য মানুষেরা যা কিছুই করুক না কেন, তাতে কেবল তাদের অধোগতিই হতে থাকে। রিদ্ধি-সিদ্ধি ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি যদিও তারা শেখে, কিন্তু তাতেও ক্রমান্বয়েই আরও পাপী-ই হতে থাকে তারা।

গীত :- হামারে তীর্থ ন্যারে হ্যায় .....
(আমাদের তীর্থ হল অনুপম, ...)

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা, এই পুরোনো দুনিয়াতে থাকা সত্ত্বেও, প্রকৃত অর্থে তোমাদের কিন্তু এই দুনিয়ার সাথে কোনও সম্পর্কই নেই এখন। নতুন দুনিয়াতে যাবার লক্ষ্যে তোমরা পুরুষার্থ করে চলেছো - অসীম বেহদের বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়ার জন্য। অবশ্য যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই দুনিয়া স্থাপিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যদিও এই পুরোনো দুনিয়াতেই থাকতে হচ্ছে, কিন্তু তোমাদের পুরোপুরি লক্ষ্য থাকবে স্বর্গ-রাজ্যের পৌঁছোবার জন্য প্রকৃত উপার্জন করার। বিনাশ যখন অবসম্ভাবী, আর তার লক্ষ্যণও তো এখন তোমরা তোমরা উপলব্ধিও করছো। তোমরা এও জানো যে, এই রুদ্র জ্ঞান-যজ্ঞ থেকেই সেই বিনাশের অগ্নি-শিখার জ্যোতি প্রজ্বলিত হয়েছে। এই যে মহাভারতের যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে, অবশ্যই তা আমাদের এবং সমগ্র ভারতের কল্যাণের জন্যই। বাস্তবে এ যুদ্ধ কিন্তু একে অন্যের সাথে লড়াই করার যুদ্ধ নয়। এছাড়াও, তোমরা তো ডবল-অহিংসক সেনানী। তোমাদের মধ্যে না আছে কামাগ্নির হিংসা আর না থাকে ক্রোধের আগুণ। এদের মধ্যে প্রধান বিকার হলো কাম-ভাব। এর ফলেই তো বর্তমানের এই দুনিয়াটা আজ এত পতিত দুনিয়া। কিন্তু কেমন করেই বা তোমরা এত বেশী পতিত হয়ে গেলে ? --এইসব বিকারগুলির কারণে। এই কাম-বিকার শুরু হয়েছে কল্পের মধ্য সময় থেকে। যা আজ তোমাদের দুঃখের কারণ। ক্রোধের ব্যাপারটা যদিও ততটা নয়। এ সবই অপবিত্রতা আর পবিত্রতার বিষয়। এই কাম-বাসনাই মানুষকে যত ধোকা দিয়ে ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে থাকে। এই কাম-বাসনার কারণেই অবলা নারীদের উপর যতসব অত্যাচার হয়ে থাকে। কেউ একটু পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলেই, স্বামী যদি পবিত্র আচারে না থাকে তখন স্বামীর সাথে তার ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। তাই তো বাবা বলছেন, জ্ঞান-চিতায় বসতে চাইলে, উভয়কেই পবিত্রতা রক্ষার লক্ষ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। কিন্তু, জাগতিক গুরুরা উল্টে কাম-চিতায় বসবার নিদান দেয়। কিন্ত এখানে এমন কেউ এলে, বাবা কিন্তু তাদের প্রত্যাখ্যান করেন। যেহেতু এখন নতুন পবিত্র দুনিয়া স্থাপনের কার্য চলছে, তাদেরকেও সাথে নিলে এই পবিত্র দুনিয়া স্থাপনের কার্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে যে। একমাত্র জ্ঞান-চিতায় বসেই পবিত্র হয়ে, তোমরা সেই পবিত্র দুনিয়ার

মালিক হতে পারবে। যার জন্য এই পবিত্রতার যুদ্ধ লড়তে হয় তোমাদের। বাস্তবে তোমাদের এই পবিত্রতার যুদ্ধ ভয়ঙ্কর বিপদজনক যে কোনও শারিরীক বাহুবলের যুদ্ধের থেকেও, যেহেতু রাবণ তোমাদের চিরশত্রু। আর সেই বিকার-রূপী রাবণের সাথে যুদ্ধ করেই জয়ী হতে হয় তোমাদের। (শ্রীমৎ অনুসারে) তোমরা নিজের মনের সাথে বাবার সঙ্গে যতই বুদ্ধিযোগে থাকতে পারবে ততই বল ও শক্তি পাবে। সব সমাধানেরই একমাত্র উপায় শ্রীমৎ অনুসারে চলা। শ্রীমৎ-ই আমাদের জানায়, ঘর-গৃহস্থালী ব্যাবহারে থেকেই সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ হতে হবে। আত্মার অধীনেই থাকতে হবে তোমাকে। এই আত্মাই একদা ১৬-কলা সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু ৮৪-বার জন্ম নিতে নিতে তার সেই গুণের কলা ধীরে ধীরে অধোগতিতে আসতে থাকে।

বাচ্চারা, তোমরা তো অবশ্যই তা জানো, পূর্বে কখনও এখানেই দেবী-দেবতারা রাজত্ব করতেন। রামরাজ্য অবশ্যই এখানেই স্থাপিত হয়েছিল। তাই তো রামের নাম অনুসারে লোকেরা রামরাজ্য নামটাই রেখেছে। কিন্তু, প্রকৃত অর্থে - শিবেরই নাম 'রাম'। তাই তো লোকেরা বলে শিবায়ঃ নমঃ। রামায়ঃ নমঃ কিন্তু কেউ বলে না। এই 'শিববাবা' শব্দটি একেবারেই 'সঠিক-শব্দ'। কিন্তু রামকে কেউ-ই বাবা বলে না। শিবকেই সবাই বাবা বলে ডাকে। রাম শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ পরমপিতা পরমাত্মা। কিন্তু তা মোটেই এমন নয় যে, ক্ষত্রিয় কুলের রাঘব রঘুপতি রাজাই সেই রাম। অথচ, মানুষেরা একবার যা শোনে, তারই প্রচার করতে থাকে। বাচ্চারা, তাই তো কেবল তোমরা ছাড়া বাকী অন্যেরা কেউ-ই পরমপিতা পরমাত্মার সাথে যথার্থ রীতিতে স্মরণের যোগে একাত্মা হতে পারে না। তারা মনে করে পরমাত্মা তো ব্রহ্ম - জ্যোতি স্বরূপ। যার কোনও নামও নেই, রূপও নেই। কিন্তু ব্রহ্ম বলা মানেই তো তার নামও আছে, রূপও আছে। আসলে তারা এসবের কিছুই বোঝে না। তাই বাবা বলছেন, "আমি জ্ঞানের সাগর। যদিও আমি খুবই সূক্ষ্ম। এর থেকে সূক্ষ্ম আর কোনও কিছুই নেই। অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম। যেমন এক বিশাল (বট) বৃক্ষের বীজ অতি ক্ষুদ্রাকারের হয়। যা দেখতে কত ছোট। আর মনুষ্য সৃষ্টির বীজ তো সবচাইতে সূক্ষ্ম। পোস্তর দানা সবচাইতে ছোট হয়। সেগুলি কত সূক্ষ্ম। অথচ পোস্তর গাছ কত বড়-বড় হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে পরমপিতা পরমাত্মা তো সেই দানার থেকেও অনেক গুনে ছোট, একেবারে অতি ক্ষুদ্র এক বিন্দু যেন।"

এবার বাবা আবার বলছেন : "আমি যেই হই না কেন, যে রকমই হই না কেন, তোমাদের মধ্যে তা উপলব্ধি করতে পারো, অবশ্য তা ক্রমিক নম্বর অনুসারে। হয়ত বা কোটির মধ্যে একজন এই রহস্যকে বুঝতে পারে। শিববাবার মতন এমন গুণ আর মহিমা কোনও মনুষ্য আত্মার হতে পারে না। একবার ভেবে দেখো, কিভাবে উনি স্বয়ং এখানে এসে এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান। বাচ্চাদের সামনে বসে, বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের পাঠ পড়ান। অন্যেরা এসবের কিছুই বুঝতে পারবে না। তারা যেমন আমাকে জানে না, তেমনি সৃষ্টি-চক্রকেও জানে না। অবশ্য তোমরা এখন তা উপলব্ধি করছো, তোমাদের নিজের-নিজের পুরুষার্থের ক্রমিক অনুসারে। বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়ার সাথে যুক্ত কোনও কিছুর প্রতিই এখন তোমাদের আর কোনও আকর্ষণই নেই। জগতের মানুষেরা এখনও ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। এটা যেমন তাদের সংস্কার, কিন্তু, তোমাদের সংস্কার তোমাদের নিজের মতন। তোমরা এখন গুপ্ত যোগবলের সেনানী। কিন্তু, জগতের সেনারা বাহুবলে বলীয়ান সেনানী। তাদের সেসব তোমরা জানতে পারো। কিন্তু তোমাদেরকে তারা কেউ জানতেও পারে না। বিজ্ঞানীরা গ্রহ-নক্ষত্রে যাবার প্রয়াস করে। বিজ্ঞানীরা আকাশে অনেক কিছু দেখেও থাকে আর ভাবতে থাকে, আমরা কেন সেখানে পৌঁছতে পারি না। সমুদ্রের কোনও কূল-কিনারা কেন পাই না বা তার

তলদেশে কেন যেতে পারি না। এর নিমিত্তেই তারাও কিন্তু সেই উদ্দেশ্যেই নিজেদের পুরুষার্থ করে চলেছে। কিন্তু তারা এই পুরুষার্থ করে উঠতে পারবে না, যেহেতু এই চর্ম-চক্ষু দ্বারা তা দেখা যায় না। তাদের বুদ্ধিতে কেবল স্থুল জিনিষের কথাই আসে, তাই তারা কেবল তারই পুরুষার্থ করে। সূক্ষ্ম থেকেও অতি সূক্ষ্ম পরমাত্মাকে তো তারা জানেই না যে, পরমাত্মা স্বয়ং নিজে এসে বাচ্চাদেরকে তার নিজের পরিচয় জানান। তোমরা যে খুব বড় ডিম্বাকৃতি বড় একটা জ্যোর্তিলিঙ্গ বানিয়েছো, তাতেই বোঝা যাচ্ছে, তোমাদের বুদ্ধিতে তোমরা তা বুঝতে পেরেছো। বাবা এভাবেই বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে যাচ্ছেন: বাবার যেমন গতি-মতি অন্য সবকিছু থেকে আলাদা- বাচ্চারা, তেমনি তোমাদের সদগতির মত-ও জগতের অন্য সবার থেকে স্বতন্ত্র। একমাত্র এই জ্ঞান আর যোগ ছাড়া জগতের অন্য কিছুর প্রতিই তোমাদের কোনও আগ্রহ নেই। বাচ্চারা, তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো। ব্রাহ্মণেরা অত বেশী বিস্তারে যায় না। জাগতিক ব্রাহ্মণেরা নিজেদের ব্রহ্মার সন্তান বলে চালায়। কিন্তু, ব্রহ্মা তো আসলে প্রজাদের পিতা অর্থাৎ প্রজাপিতা। কিন্তু, ওনার পিতা তবে কে ? তা তো কেউ জানে না। তারা আবার ওনাকে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মাও বলে। লিন্তু এক ব্রহ্মার তিন রূপ হয়-ই বা কি প্রকারে ? আসলে তো এরা তিনজন দেবতা। এই তিন দেবতার কর্ম-কর্তব্যও পৃথক-পৃথক। সব কিছুরই রচয়িতা কিন্তু এক ও একমাত্র শিববাবা। আমরা সবাই তারই রচনা, এমন কি বাকী যা কিছু আছে এই দুনিয়ায় । উঁচ্চ থেকেও অতি উচ্চ, সর্বোচ্চ পিতা বা পরমপিতা পরমাত্মা। পরম আত্মা একমাত্র নিরাকার বাবাকেই বলা হয়। তা বলে এমন নয় যে, উঁনি যেমন নিরাকার পরম আত্মা, আমরাও তেমনি নিরাকার আত্মা, এবং সবকিছুই ওনার মতনই নিরাকার হবে! মোটেই তা নয়। এক্ষেত্রে বাবা আর বাচ্চার মধ্যে বিস্তর তফাৎ। বাবা ওনার বাচ্চাদের এইসব জ্ঞানই দিয়ে থাকেন। কিন্তু জাগতিক পুঁথি-শাস্ত্রে তো এসব কাহিনী লেখাই নেই যে, পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং সামনে বসে ব্রহ্মা-বংশী ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জ্ঞানের পাঠ পড়ান। তাই পরমাত্মা অবতরণ করে প্রথমেই এই ব্রহ্মা-মুখবংশাবলী দত্তকদের রচনা রচান।

সৃষ্টিচক্রের চিত্রনাট্য যখন সম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ হয়, তখন বাবা অবতারিত হয়ে পতিত দুনিয়াকে শেষ করে পবিত্র দুনিয়ার শুরু করান। অতএব বর্তমানের এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে উনি অবশ্যই এই দুনিয়াতেই অবস্থান করছেন। আত্মাদের পবিত্র হতে সময় কিছুটা তো লাগবেই। যেহেতু বিগত অর্দ্ধ-কল্প ধরে আত্মাদের মধ্যে পাপ-কালিমার ময়লা জমে আছে। আত্মায় এই জমা ময়লা ভষ্ম হয়ে বেড়িয়ে যায় যোগ-অগ্নির দ্বারা। এখন তোমাদেরও সতোপ্রধান অবস্থায় আসতে হবে। তোমাদের এই অপবিত্র-পতিত অবস্থা থেকে স্মরণের যোগ দ্বারা পবিত্র অবস্থায় আসতেই হবে। খুবই সহজ এই পন্থা। মনে রাখবে, তোমাদেরকেই আবার ৮৪-জন্ম চক্রে আসতে হবে। ইতিমধ্যেই তোমরা সেই জ্ঞান পেয়েছো। বাবাও তাই বলেন, উনি নিজেও আবার এসেছেন তোমাদেরকে পবিত্রতার রাজ-যোগ শেখাতে। এই বাবা কেবলই আশীর্ব্বাদী-বর্সা দিয়ে থাকেন, যেখানে রাবণের কাজই হলো আত্মাদের অভিশাপ দেওয়া। এসব কথা একমাত্র এই বাবা-ই বসে বসে তার বাচ্চাদেরকে বোঝাতে থাকে। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে বাবা অবতারিত হয়ে, বাচ্চাদের সকল শুভ মনোকামনাগুলি পূর্ণ করেন। আর অশুভ মনোকামনাগুলি পূরণ করে মায়া। রিদ্ধি-সিদ্ধি, তন্ত্র-মন্ত্রধারীরা অনেক টাকাও রোজগার করছে আজকাল। মায়া-ই সেই অশুভ মনোকামনাগুলি পূর্ণ করে। এইসব রীতি-নীতিরও অনেক পুঁথি-পত্র হয়। কিন্তু তোমাদের এই পাঠে কোনও পুঁথি-শাস্ত্রের ব্যাপার নেই। শাস্ত্র ইত্যাদি পঠন-পাঠনের প্রয়োজনও পড়ে না তোমাদের। যেহেতু, স্বয়ং বাবার শ্রীমৎ

আছে যে তোমাদের। তাই বাবা বলছেন: বাচ্চারা, নিজেরা পবিত্র হও এবং অন্যদেরকেও পবিত্র বানাও। অপবিত্র কখনই হয়ো না যেন। তোমাদের ডিপার্টমেন্টই যে ভিন্ন প্রকারের।

কল্প পূর্বে যারা ব্রাহ্মণ হয়েছিলো, তারাই আবার ব্রাহ্মণ হবার পুরুষার্থ করবে। দেবতাদেরও কেমন স্থান ও পদ পরিবর্তন (স্যাপলিং) হয় দেখো। দিনে দিনে লোকেরা ব্রাহ্মণ হবার জন্য আসতেই থাকছে। যারা অল্প-বিস্তর শুনে সামান্য জ্ঞানী হবে, তারা প্রজার পদ পাবে। যদিও তারা সত্যযুগের রাজধানীতেই আসতে পারবে। মৃত্যুর বিপদ যে এখন দোরগোড়ায়। সঙ্ঘাত-সঙ্ঘর্ষ কখনও বা খুব জোরদার হবে, আবার কখনও বা তা বন্ধও থাকবে। বুদ্ধিতে যা আসে, তাতে মনে হয়, আরও কিছু সময় এখনও বাকী আছে। যেহেতু (সত্যযুগের) রাজধানী এখনও স্থাপিত হয়নি। এখনও তোমরা সব রাজা ও সন্ন্যাসীদের এই জ্ঞানের কথা শোনাতে পারোনি। তাই বিবেক বলছে বিনাশের এখনও কিছু সময় বাকী আছে। কিন্তু বিনাশের এই রিহার্সেল তো চলতেই থাকবে। সত্যি কি আশ্চর্যের - তাই না ! মানুষেরা জাগতিক যজ্ঞের রচনা করে লড়াই-ঝগড়া বন্ধ করার জন্য আর ভগবান যজ্ঞ রচনা করেন সম্পূর্ণ দুনিয়ার পরিবর্তনের জন্য, যা বিনাশ প্রক্রিয়ার দ্বারা ঘটে থাকে। আবার, ভগবান যদি অল্প কিছু শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন লোকেরা বলবে- তারা যে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করেছে, তাতেই তা সেই শান্তি এসেছে। যদি একবার তারা ভেবে নেয় যে, তাদের যজ্ঞ সফল হয়েছে, তবে তো তা লাগাতর চলতেই থাকবে। বৃষ্টির আহ্বান করে তারা যখন যজ্ঞ করে, তারপর বৃষ্টিপাত হলে তারা আনন্দে নাচতে থাকে। আর বৃষ্টি না হলে তখন বলবে, এ তো ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যেমন, যখন কোনও আত্মা শরীর ছাড়ে, তখন তারা বলে থাকে সেই ব্যক্তির স্বর্গ-প্রাপ্তি হয়েছে। সোক্ষেত্রে, তবে তো তার জন্য কোনও শোক করা উচিত নয়। স্বর্গে পৌঁছানো মানে বিশাল সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া। আসলে মায়া-রাবণ সবারই বুদ্ধির ঘটে তালা লাগিয়ে রেখেছে যে। কিন্তু কেবল তোমরাই কেবল অনুধাবন করতে পারো, কল্প পূর্বে তোমরা যেমন পুরুষার্থ করেছিলে, এখনও আবার ঠিক তেমনি পুরুষার্থ করছো তোমরা।

একমাত্র এই ভারতবর্ষই অবিনাশী খণ্ড। শুরুতে একমাত্র দেবী-দেবতা ধর্ম ছাড়া আর অন্য কোনও ধর্মই থাকে না তখন। অন্যান্য ধর্মগুলি ধীরে ধীরে অনেক পরে তার প্রকাশ ঘটে। এটাই এই অবিনাশী ড্রামার ভবিতব্য। বিনাশ পর্বে রক্তের নদী এখানেই বইবে। একে অপরের সাথে লড়াই করতেই ব্যস্ত থাকবে। যদিও অনেক কাল যাবৎ তারা একে অপরের ভাই-ভাই ব্যাবহারের মধ্যে থাকে। কিন্তু ঐ যে হিন্দু আর মুসলমান পৃথক পৃথক ধর্ম। এদের প্রত্যেকেরই আবির্ভাব হয়েছে অনেক পরে। তাই এদের নিজেদের মধ্যেই লড়াই-ঝগড়া চলতে থাকে। এর সাথে তোমাদের কোনও সম্পর্কই নেই। তোমাদের কেবল নিজেদের সেবার প্রতি তৎপর হতে হবে। আর তার জন্য প্রথমে কেবলমাত্র পৃথিবীর তিন পা জমি নিয়ে ঈশ্বরীয় হাসপাতাল খুলতে হবে। যা ক্রমেই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকবে। যেমন ফোঁটা-ফোঁটা জল থেকেই তো দীঘি হয়। নিজেদের ঘরেও এইসব চিত্র রাখবে। তাদেরকেও বলবে, বেহদের বাবার থেকে ২১ জন্মের আশীর্বাদী বর্সা কিভাবে পাওয়া যেতে পারে, এসো তা বোঝাই তোমাদের। মৃত্যু যে আমাদের দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে আছে। এখন কেবল বেহদের এই বাবা আর তার আশীর্বাদকেই স্মরণ করতে থাকো। যেহেতু এটা এখন মৃত্যুর দুনিয়া। তাই বাবা জানাচ্ছেন, কেবলমাত্র আমাকেই যদি স্মরণ করতে থাকো, তবে আমিই তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাবো। বাবা বলছেন : তাই তো আমাকে বলা হয়, কাল (মৃত্যু) -এরও কাল অর্থাৎ মহাকাল। আমি যে অকাল তখৎ অর্থাৎ পরম অবিনশ্বর। তোমরা আত্মারাও অকাল অর্থাৎ

অবিনশ্বর। একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই এসব বোঝো, তাই এই দুনিয়ার অন্যদের থেকে তোমরা একদমই আলাদা। এখানে পড়াবার শিক্ষকও বিচিত্র ধরনের। যিনি কেবল আত্মাদের সাথেই বার্তালাপ করেন, আর আত্মারাই তা শোনে। আত্মা তা শোনে, আবার আত্মাই তার মুখ দ্বারা তা শোনায়, আত্মা তার কান ইন্দ্রিয় দ্বারাই তা শুনে থাকে। আমি আত্মা এই শরীর দ্বারা এইসব কার্য করে থাকি। ফলে আত্মার রসনা প্রাপ্তি হয়। যেমন আত্মাই কিন্তু এমনটা বলে - এটা মিষ্টি, এটা টক্। এই আত্মাতেই তার সংস্কার থাকে। সেই আত্মাদেরকেই তাদের পিতা পরমাত্মা জানাচ্ছেন, এবার যে তোমাদের ঘরে ফেরার পালা। তোমদের ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে, এখন এই জরাজীর্ণ শরীর ত্যাগ করা উচিত। তাই শরীরের প্রতি আর মমত্ব রেখো না। সাপও তার শরীরের প্রতি মমত্ব রাখে না, পুরোনো চামড়া ত্যাগ করলেই সে জায়গায় নতুন চামড়া আসবেই। তোমাদের শরীরও তেমনি পুরোনো হয়েছে, তাকেও এভাবে ত্যাগ করা উচিত। ভোঁমড়ার উদাহরণও তোমরা ভাবতে পারো। বাস্তবে, জগতের কোনও সন্ন্যাসীও এই ভাবে উদাহরণ সহযোগে এসব বোঝাতে পারবে না। এই অপবিত্র দুনিয়ায় সবাই যেন বিকারী পোঁকা-মাঁকড়। তোমরা ব্রাহ্মণীরাই ভুঁ-ভুঁ করে জ্ঞান শুনিয়ে তাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাও। আর তাদের বলো, শিববাবাকে স্মরণ করতে। এটা ঠিক ম্যাজিকের মতন - মানুষকে দেবতা বানাবার আশ্চর্য জাদু। তাই বাবারও অনেক নাম - জাদুকর, রত্নাকর, সওদাগর, ইত্যাদি, ইত্যাদি .....।

আচ্ছা বাচ্চারা, আমি তো তোমাদের এত করে বোঝাই। কেবল এটুকুই নয়, তোমাদের কত করেই বলে থাকি বাবাকে আর ওনার আর্শীবাদকে স্মরণ করতে। বাবা আরও জানাচ্ছেন, তোমরা যদি বাবার প্রতি একবার সমর্পিত হও, বাবার থেকে প্রাপ্য অধিকারও বাবা তবে তোমাদের সমর্পণ করে দেন ২১ বারের জন্য। সত্যি, কি সুন্দর এই সওদা - তাই না ? শিববাবা তো দাতা-স্বরূপই। উনিই তোমাদের সেই বুদ্ধি বলে দেবেন, কিভাবে সবকিছুর মমত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। ঘর-গৃহাস্থলী ব্যাবহারে থেকেও শ্রীমৎ অনুসারে চলবে, পবিত্রতাই তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান। তোমাদের তীর্থযাত্রা হলো, রুহানী যাত্রা। সবকিছুই নির্ভর করছে এই যাত্রা উপর। মানুষেরা কত প্রকারের হরেক যাত্রা করে। কিন্তু, তোমাদের কেবল এই এক প্রকারেরই যাত্রা। তোমাদের শেখানো হয় কিভাবে এক জায়গায় বসে বসেই যাত্রার মাধ্যমে আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন ঘটানো যায়। এসবই কেবল বুদ্ধির ব্যাপার। ফলে দুঃখ তোমাদের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। তোমরা এও জানো যে এত বড় বিনাশ পর্ব যে ঘটতে চলেছে, তা তোমাদের মঙ্গলের জন্যই। সুতরাং তোমাদের মনে দুঃখ আসারও কোনও কারণ নেই। তবুও যদি মনে দুঃখ আসে, তবে বুঝতে হবে এই শিক্ষায় এখনও তোমরা কাঁচা অথবা জ্ঞানের সম্পূর্ণ অবস্থায় এখনও পৌঁছতে পারোনি তোমরা। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শরীর রূপী পুরানো দেহের প্রতি মমত্বকে দূর করতে হবে। বুদ্ধির দ্বারা রুহানী যাত্রাতে তৎপর হতে হবে।

২) পুরানো দুনিয়ার কোনও কিছুর সাথেই কোনো সম্পর্ক না রেখে, জ্ঞান চিতায় বসে পবিত্র হয়ে বাবার আশীর্বাদী-বর্সা পুরোটাই পেতে হবে।

বরদান :- নিজের পূজ্য-স্বরূপের স্মৃতিতে স্থিত, সদা রুহানী নেশায় থাকতে সমর্থ জীবনমুক্ত ভব

বিস্তার :- ব্রাহ্মণ জীবনের প্রকৃত মজা জীবনমুক্ত স্থিতিতে। যে নিজে পূজ্য-স্বরূপের স্মৃতির স্থিতিতে থাকে, তার দৃষ্টি এক ও একমাত্র বাবার প্রতিই নিবদ্ধ থাকে, তখন সে আর নিজেকে এমনটা ভাবতেই পারে না যে, অন্য কোথাও আছে। এমন পূজ্য আত্মাদের সম্মুখে স্বয়ং ব্যাক্তির ব্যাক্তিত্ব আর বৈভব স্বতঃতই নতঃশির হয়ে যায়। পূজ্য-ব্যক্তি কখনও জাগতিক কোনও কিছুরই প্রতি আকৃষ্ট হয় না। দেহ, সম্বন্ধ, পদার্থ বা সংস্কারেও তার মন-বুদ্ধির আকর্ষণ থাকে না। সে কখনও কোনও বন্ধনে নিজেকে বেঁধে রাখে না। সদা জীবনমুক্ত স্থিতির অনুভব করতে থাকে।

স্লোগান :- প্রকৃত সেবাধারী সে হতে পারে, যার মধ্যে নিমিত্ত আর নির্মাণ ভাব আছে।